যুগান্তর

তারিখ 27 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

এ কে এম শাহনাওয়াজ

টিআইবির রিপোর্ট হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ নেই

টিআইবি দুর্নীতি, অব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে তাদের গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। বেশির ভাগ সময়ে এসব রিপোর্ট দেখে সরকারপক্ষ অখুশি হয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। টিআইবি পাল্টা তথ্য দিয়ে তাদের গবেষণা যে যথার্থ তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে না। ফলে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধোঁয়াশা থেকে যায়। এতে দেশের আদৌ কোনো কল্যাণ হয় কিনা বুঝতে পারি না।

আমরা যারা কলাম লিখি তাদেরও একটি সংকট থাকে। প্রায়ই পরিচিতজনরা প্রশ্ন রাখেন— এই যে আপনারা রাজনীতি, নানা অন্যায় ইত্যাদি নিয়ে লেখেন, নিজের খেয়ে বুনো মোষ তাড়ানোর মতো করে নানা হিতোপদেশ দেন, সেসব কি অরণ্যে রোদন নয়? যাদের জন্য লেখেন তারা কি পড়ে দেখেন? অর্থাৎ নেতা, মন্ত্রীসহ ক্ষমতাবানদের প্রতি তারা ইঙ্গিত করতে চান। আমি সলজ্জ হেসে বলি, তারা যে পড়বেন এমন আশা মোটেই করি না। বড় মানুষদের এত সময় কোথায় ছাইপাশ পড়ার। আমরা লিখি সাধারণ পাঠকের জন্য। তারা পড়ে নিজেদের সচেতনতা যদি ঝালাই করে নিতে পারেন, সরব হতে পারেন, তাহলে কোনো না কোনোভাবে ফিরে তাকাতে হবে ক্ষমতাবানদের। জনগণের শক্তিকে শেষ পর্যন্ত অবহেলা করা যায় না। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটাররা কি সে কথা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেননি!

টিআইবি তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করলে ক্ষমতাসীন বা সংশ্লিষ্টরা কেন যে হৈচৈ বাধিয়ে দেন আমি বুঝতে পারি না। আমরা তো জানতাম নিষ্কলুষ মানুষ অহেতুক সমালোচনা গায়ে মাখে না। আর দুর্বলচিত্ত হলে হৈচৈ বাধিয়ে সব আড়াল করতে চায়। এতকাল টিআইবি যেসব রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার কথা রয়েছে; কিন্তু এসব রিপোর্টের বক্তব্য যদি সরকারকে বিব্রত করার জন্য একান্তই বানানো গল্প হয়, তাহলে তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সরকারের মুখপাত্ররা প্রকৃত সত্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু দায়িত্বশীলরা যেভাবে অগ্নিশর্মা হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন, তাতে মনে হয় হৈচৈ না বাধালে সরকার বোধহয় ক্ষমতা হারাবে। আমার বক্তব্য একটু আলাদা। আমি সরকারের ক্ষমতাবান কেউ হলে টিআইবির সব রিপোর্টকেই স্বাগত জানাতাম। বিনে পয়সায় একটি গবেষণা রিপোর্ট হাতে পেয়ে তা থেকে যদি নিজেদের শুদ্ধ ও সংস্কার করার পথ পেয়ে যাই তবে মন্দ কী! একটি সৎ সরকারের তো তেমন চিন্তাই করার কথা। সব কিছুতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ না খোঁজাই ভালো।

আমি পেশাগত দিক থেকে অন্য অঞ্চলের মানুষ। এতকাল টিআইবির প্রকাশ করা রিপোর্টের বক্তব্য-বিষয় আমার পেশাগত জীবনের সঙ্গে তেমন সংশ্লিষ্ট নয় বলে এসবের সত্য-মিথ্যা নিয়ে তেমন করে ভাবিনি; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট যে অন্যায়-দুর্নীতির কথা উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে অবশ্যই নড়েচড়ে বসেছি। শুধু আমি একা নই, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাই চমকে উঠেছেন। তবে আমি বিশ্বাস করি কেউ বিস্মিত হননি। আমাদের হাতে প্রমাণ নেই, টিআইবিও প্রমাণ জনসম্মুখে উপস্থাপন করেনি; কিন্তু এর প্রতিটি অভিযোগই অনেক বছর ধরে পল্লবিত হয়ে আছে ক্যাম্পাসে। বিড়ালের গলায় কেউ ঘন্টা বাঁধেনি। টিআইবি সে ঘন্টা বাঁধার বড় দায়িত্বটি পালন করেছে শুধু। এ রিপোর্ট প্রকাশের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে সংশ্লিষ্টজনদের উচিত ছিল অভিযোগগুলো আমলে এনে তদন্ত করে দেখার। সততার সঙ্গে তদন্ত করলে ঝুলির বিড়াল বের হয়ে যাবে, সে কারণে কি অনেকের মধ্যে আতংক কাজ করছে?

টিআইবি অভিযোগ করেছে, প্রকৃত মেধাবী বিচারে নয়, বিপুল অংকের ঘুষের বিনিময়ে এবং রাজনৈতিক পরিচয়ে প্রভাষক নিয়োগ করা হয়। একে মারাত্মক অভিযোগ মনে করে শক্তিশালী কমিটি গঠন করে তদন্তের ঘোষণা দেয়া যৌক্তিক ছিল। বিগত এক-দেড় দশক ধরে এ ধরনের অভিযোগ ক্যাম্পাসের ভেতর বরাবরই শোনা যাচ্ছে। এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাগজে-কলমে স্বায়ত্তশাসিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনেকটাই সরকার নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিলাম। এ দেশের দিকে যদি তাকাই তবে কী চিত্র দেখব? ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতেন বিদগ্ধ পণ্ডিতজন, যাদের কাউকে চিনিয়ে দিতে হতো না। ফলে সবচেয়ে কীর্তিমান মেধাবী শিক্ষার্থীকেই তারা শিক্ষক হিসেবে পেতে চাইতেন। রাজনীতি বা রাগ-অনুরাগ সেখানে খুব একটা কাজ করত না। বিভাগের শিক্ষকরাও নজর রাখতেন তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবীর দিকে। তাকে আরও চৌকস হওয়ার জন্য বাড়তি শ্রম দিতেন। তেমন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। সবই নষ্ট হয়ে গেছে ক্যু রাজনীতি প্রবেশ করায়। ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের অপব্যবহার করে পাণ্ডিত্য নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারদলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সরকারের প্রতি অতি অনুগতদের এখন পছন্দ করা হয় উপাচার্য হিসেবে। গণতান্ত্রিক ধারাক্রম দেখাতে কখনও সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ হলেও তাতে নানা শুভংকরের ফাঁক রাখা হয়। নির্বাচন করে হোক বা বিনা নির্বাচনেই হোক, সরকার-অনুগতদেরই দায়িত্বে আনা হয়। তারা সবাই যে পাণ্ডিত্যের দিক থেকে খাটো তেমন নন, তবে প্রায় ক্ষেত্রেই তারা রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় বন্দি থাকেন। অনেকের কথা শুনতে হয়। আর এসবের ফাঁক গলে নানা অন্যায়-দুর্নীতি ঢুকে পড়ে। গত এক দশক আগেও টাকার বিনিময়ে শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারী নিয়োগের 'গুজব' শোনা যেত না। তখন মেধাবীদের ডিঙিয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ে বা প্রভাবে অনেকে শিক্ষক হতেন; কিন্তু যখন দেখা গেল তেমন সরকারদলীয় রাজনীতির পরিচয়ও নেই আবার সার্টিফিকেটেও সর্বোচ্চ ফলাফল নয়, তবুও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন, তখনই চাউর হতে থাকে অর্থশক্তির ভূমিকার কথা।

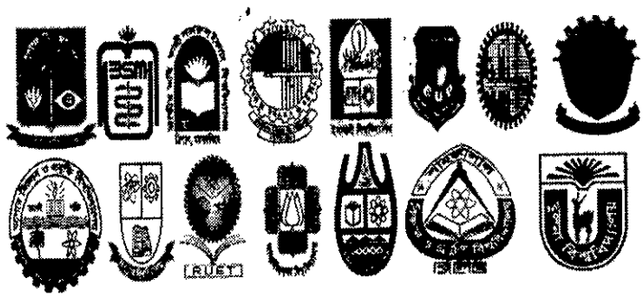

বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে প্রশাসনে নষ্ট রাজনীতিকরণ সম্পন্ন হওয়ার কারণে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে। দায়িত্ববান শিক্ষক-গবেষকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় তার গরিমা ও সৌন্দর্য হারাচ্ছে প্রতিদিন। একটি জাতির জন্য এর চেয়ে মহাদুর্যোগ আর কিছু হতে পারে না।

অবস্থাটা এখন এমন সঙ্গীন হয়েছে, যা গত সপ্তাহের এক বাক্যালাপ থেকেই বোঝা যাবে। আমার এক আত্মীয় ফোন করলেন, তার মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো এক বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম হয়েছে। কয়েকটি প্রকাশনাও রয়েছে। তার ফোনের উদ্দেশ্য আমি যাতে একটু তদবির করে দিই। অন্তত যাতে মেধার বিচারে নির্বাচন হয়। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'দেখুন, ভালো ফলাফলই এখন শেষ কথা নয়, আপনি বরঞ্চ মন্ত্রী, এমপি বা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের ধরতে পারেন। অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে শক্তভাবে যোগাযোগ করতে পারেন কিনা দেখেন।' অন্য আরেকটি পথ আমার চেনা নেই বলে সে পরামর্শ দিতে পারলাম না।

এতকিছু শোনার পরও আমার আত্মীয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো একদিন পর আমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এলেন ক্যাম্পাসে। শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা বোঝাতে নিজের উদাহরণ টানতে হল। বললাম, এই নষ্ট সময়ের ছাত্র হলে আজ অবশ্যই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারতাম না। প্রথম কারণ আমার গায়ে রাজনৈতিক পরিচয়ের তকমা নেই। টিআইবির গবেষণা মতো এ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়ার রাস্তা আছে কিনা আমার জানা নেই। যদি জানাও থাকত তাহলে পারিবারিক শিক্ষার কারণে সে পথে যেতে পারতাম না। যোগফলে আমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার দরজা বন্ধ থাকত। ১৯৮৪-এর জানুয়ারিতে আমি প্রভাষক হিসেবে যোগ দেই। তখন উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। বিভাগের সভাপতি প্রখ্যাত অধ্যাপক আবু ইমাম। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী পরীক্ষার ফলাফল ও প্রকাশনার শক্তিতে আমার বিশ্বাস ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারব; কিন্তু এমএ পাস করার সময় ইতিহাস বিভাগে কোনো পদ খালি ছিল না। অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার সুযোগ হয়ে গেলে উপাচার্য এবং আমার শিক্ষক অধ্যাপক আবু ইমাম একরকম জোর করে ধরে এনে এডহক নিয়োগের চিঠি ধরিয়ে দিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়েই আটকে রাখলেন। এটিই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য।

টিআইবির রিপোর্ট পড়ে পত্রিকায় দেখলাম অনেকেই ক্ষেপে গেছেন। বলতে চেয়েছেন এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মানহানি করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এসব অপকর্মের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ শিক্ষক যুক্ত থাকেন না। সত্যিকার অর্থে এসব অপকর্মে যুক্ত না থাকলে তাদের সম্মানহানির কোনো কারণ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাই চান একটি নিষ্কলুষ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় তার মর্যাদা ফিরে পাক।

ইউজিসির ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশের যৌক্তিক কারণ ছিল। অবশ্যই টিআইবি রিপোর্টের একটি দুর্বলতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে ইউজিসির কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না, তা গবেষকদের জানা থাকা উচিত ছিল। তবে আমরা মনে করি, এই ক্ষোভ প্রকাশের পর পুরো রিপোর্টটি উড়িয়ে না দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার দায়িত্বটি ইউজিসিরই নেয়া উচিত। আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে প্রশাসনে নষ্ট রাজনীতিকরণ সম্পন্ন হওয়ার কারণে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে। দায়িত্ববান শিক্ষক-গবেষকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় তার গরিমা ও সৌন্দর্য হারাচ্ছে প্রতিদিন। একটি জাতির জন্য এর চেয়ে মহাদুর্যোগ আর কিছু হতে পারে না।

আমি পত্রিকার এই সীমাবদ্ধ জায়গায় টিআইবির সব ক'টি অভিযোগ নিয়ে কথা বলতে পারলাম না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো সময় সেসব বলার সুযোগ থাকবে। তবে আমি মনে করি, টিআইবির রিপোর্টকে হালকাভাবে না নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত। আর্থিক অনাচারের কথা উঠে এসেছে বলে আমি দুদককেও অনুরোধ করব তদন্ত করে দেখার জন্য। চোখের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হয়ে যাওয়াটা সত্যিই বড় পীড়াদায়ক।

এ কে এম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com